আমাদের জাতীয়ভাব

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত।

আলবর্ট হলে পঠিত।

কলিকাতা,

২ নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, ভিক্টোরিয়া প্রেসে,

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৮ সাল।

মূল্য ৵০ দুই আনা।

বিজ্ঞাপন।

জাতীয় ভাবরক্ষণেচ্ছু কতিপয় শিক্ষিত যুবকের উদ্‌যোগে আলবর্ট হলে একটি সভার অধিবেশন হয়। উপস্থিত প্রবন্ধটি সেই সভায় পঠিত হইয়াছিল। পরে উহা সাহিত্যনামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। এখন সংশোধিত হইয়া স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। এই সামান্য প্রবন্ধটি সহৃদয় পাঠকবর্গের কিয়দংশেও প্রীতিপ্রদ হইলে চরিতার্থ হইব।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

কলিকাতা,

২৮ শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮।
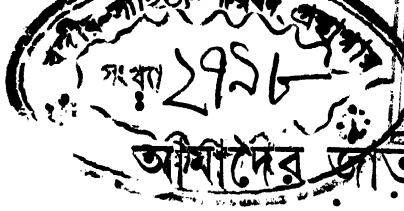
আমাদের জাতীয় ভাব।

প্রত্যেক জাতির ভাষায়, পরিচ্ছদে, রীতি নীতিতে তাহাদের জাতীয় ধর্ম্মের পরিজ্ঞান হইয়া থাকে। পারসীক যে ভাবের পরিচ্ছদ পরিধান করেন, মহারাষ্ট্রীয় সে ভাবের পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন না, হিন্দুস্থানী আবার তাঁহাদের জাতীয়ভাবসূচক অন্যরূপ পরিচ্ছদধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের ভাষা, রীতি নীতি প্রভৃতিও পরস্পর পৃথক প্রকৃতির। এক জাতির ভাষা অপর জাতি ব্যবহার করিলে বা একজাতি অপর জাতির পরিচ্ছদ ও রীতি নীতির অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার জাতি-গত বিশেষত্ব থাকে না। সুতরাং সে জাতি তাহার জাতীয় ভাব হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। এইরূপে স্বদেশীয় দ্রব্যে উপেক্ষা করিয়া,যে নিরন্তর বিদে-শীয় দ্রব্যের ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তাহারও জাতীয়ভাবের মর্য্যাদা থাকে না। ভিন্ন জাতির আক্রমণে ও ভিন্ন জাতির আধিপত্যবিস্তারে, অনেক সময়ে আক্রান্ত ও বিজিত জনপদের অধিবাসীদিগের জাতীয় ভাবের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। বিজিত জনগণ অনেক বিষয়ে বিজেতারই অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়। রোমকদিগের আক্রমণে ইঙ্গলণ্ডের প্রাচীন অধি-বাসীদিগের এইরূপ রূপান্তর ঘটিয়াছিল। গ্রীকদিগের আক্রমণে অনেক প্রাচ্য জনপদও গ্রীশের রীতি নীতিপরিগ্রহ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ বহুবার বহু বিদেশীয়কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। এই সকল আক্রমণে হিন্দু কি পরিমাণে জাতীয় গৌরবরক্ষা করিয়াছে, ভারতবর্ষ কি পরি-মাণে বিদেশীয় দ্রব্যের মুখাপেক্ষী হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার আলো-চনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রকৃতির বিশালরাজ্যে ভারতবর্ষ অতি সুন্দরস্থানে অবস্থিত। ইহার তিন দিকে অপার অনন্ত জলরাশি; আর একদিকে অনন্তসৌন্দর্য্য-ময়, অনন্ত শোভার ভাণ্ডার, অভ্রভেদী অটল গিরিবর। সুতরাং ভারত-বর্ষ প্রায় চারিদিকেই প্রকৃতিকর্ত্তৃক সুরক্ষিত। স্থলপথে দুর্গম পার্ব্বত্য ভূমি, সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কট অতিক্রম না করিলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে পারা যায় না, আর জলপথে মহাসাগরের তরঙ্গবিক্ষোভী বারিরাশি অতিবাহিত করিতে না পারিলে, ভারতের উপকূলে পদার্পণ করা যায় না। বাহির হইতে দেখিতে গেলে ভারতবর্ষে প্রবেশ করা, বহু আয়াস ও বহু কষ্টসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষ প্রকৃতির দুর্গম ও দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরে সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতি এত যত্ন করিয়া, যে ভারতবর্ষ আগুলিয়া রাখিয়াছেন, তাহাও চিরকাল বিভিন্ন জাতির আক্রমণের বহির্ভূত থাকে নাই। ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে, ভারতবর্ষের ন্যায় আর কোনও ভূখণ্ড বহুবার বহু বিদেশী-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় নাই। যে সুদূর বিস্তৃত পর্ব্বতমালা ভারতের শীর্ষদেশে বিরাট পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেছে, তাহার পশ্চিম দিকে একটি গিরিসঙ্কট প্রকৃতির বিশাল প্রাচীর ভেদ করিয়া দিয়াছে। আফ্‌গানিস্থান হইতে ঐ গিরি-সঙ্কট অতিক্রম করিতে পারিলেই ভারতবর্ষে উপনীত হওয়া যায়। অতি প্রাচীনকাল হইতে যাঁহারা রাজ্যবিস্তার, প্রভুত্বস্থাপন বা সম্পত্তিলুণ্ঠনের আশায় ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ঐ পথ অবলম্বন করিয়াছেন। ভারতবর্ষ, ঐ পথে নয়জন বিদেশী ভূপতিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে।

এই সকল আক্রমণে সময়ে সময়ে ভারতবর্ষের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। ভারতবাসীদিগকে সময়ে সময়ে অশ্রুতপূর্ব্ব দৌরাত্ম্য ও অত্যাচার সহিতে হইয়াছে। শেষে দিল্লীর রত্নসিংহাসনে হিন্দু ভূপতির পরিবর্ত্তে

পাঠান ভূপতি সমাসীন হইয়াছেন। ক্রমে মোগল ভূপতির আক্রমণে পাঠান রাজত্বের বিলয় হইয়াছে; ভারতে মোগলসাম্রাজ্যের অভ্যুদয় দেখা গিয়াছে। আবার কালের পরিবর্ত্তনে মোগলসাম্রাজ্যেরও বিলয় ঘটিয়াছে। এইরূপে খ্রীষ্টের ৫০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষে এক আক্রমণকারীর পর আব এক আক্রমণকারী উপনীত হইয়াছেন,এক রাজবংশের পর আর এক রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছে এবং এক শাসনবিধির পরিবর্ত্তে আর এক শাসনবিধির বিকাশ দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষীয়গণ তুই হাজার বৎসরেও অধিক-কাল বিভিন্ন আক্রমণকারীর অত্যাচার সহিয়াছে, বিভিন্ন রাজবিধি অনুসারে পরিচালিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন আচারব্যবহার, বিভিন্ন সভ্যতার আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখিয়াছে।

এইরূপ উপর্য্যুপরি আক্রমণে ভারতবর্ষের ধনরত্ন বিলুণ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ আত্মগৌরবে জলাঞ্জলি দেয় নাই। যখন পারস্যের অধিপতি দরায়ুস হিস্তাস্পিস্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন মহামতি শাক্যসিংহের অমৃতময়ী তত্ত্বকথায় ভারতবর্ষ সঞ্জীবিত হইতে-ছিল, এবং ভারতের ধর্ম্মজ্ঞান, ভারতের সভ্যতা, সমগ্র পৃথিবীতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছিল। যখন সেকন্দর শাহ সপ্তসিন্ধুর প্রসন্ন-সলিলবিধৌত পবিত্রভূমিতে সমাগত হয়েন, তখন তৎসহচারী গ্রীকগণ, ভারতবর্ষীয়দিগের সরলতা, সত্যনিষ্ঠা, সদাচার ও জাতীয় গৌরবের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিয়া, অতিমাত্র বিস্ময়ে তাঁহাদের গুণগান করিয়া-ছিলেন। যখন সুলতান মহমূদ বারংবার ভারতের সম্পত্তিবিলুণ্ঠনে উদ্যত হয়েন, তখনও হিন্দুর আচারব্যবহার, হিন্দুর সভ্যতা অটল ছিল। মহম্মদ গোরীর আক্রমণের পর, যখন দিল্লীতে পাঠান রাজ-ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় তখনও ভারতভূমি আপনার সাহিত্য ও আপনার রীতিনীতির সম্মানরক্ষা করিতেছিল। পাঠানরাজত্বেই বঙ্গের গৌরব

বদ্ধমূল হয়। এই সময়ে যেরূপ বাঙ্গালা সাহিত্যের বিকাশ হয়, সংস্কৃতচর্চ্চার শ্রীবৃদ্ধি হয়, এবং ধর্ম্মানুশীলনের উন্নতি হয়, সেইরূপ বঙ্গের শিল্পবাণিজ্যেরও গৌরববৃদ্ধি হইতে থাকে। গোবিন্দ দাস প্রভৃতি কবিগণ এই সময়ে চিত্তবিমোহিনী কবিতারচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য গৌরবান্বিত করেন। পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌম এই সময়ে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া নবদ্বীপ উজ্জ্বল করিয়া তুলেন, রঘুনাথ শিরোমণি এই সময়ে চিন্তামণিদীধিতিপ্রণয়ন করিয়া সমগ্র সভ্যজগতে চিরপ্রসিদ্ধি লাভ করেন, আর চিরপবিত্র ভগবৎপ্রেমে বিশ্ব-বিজয়ী বিশ্বম্ভর এই সময়ে চৈতন্য নামে পরিচিত হইয়া, মোহাচ্ছন্ন জগতে চেতনা সঞ্চারিত করেন। পক্ষান্তরে বাঙ্গালার সোণারূপার অলঙ্কার,—বাঙ্গালার কাপড়, এই সময়ে সর্ব্বত্র আদরসহকারে পরি-গৃহীত হইতে থাকে। ইউরোপের বিলাসিনীগণ স্বদেশের বস্ত্র দূরে ফেলিয়া, ঢাকার মস্‌লিনের সম্মান করিতে থাকেন। মুসলমান ভূপতি-গণ আধুনিক ইতিহাসে যথেচ্ছাচারী ও পরানিষ্টকারী বলিয়া নিন্দিত হইতেছেন, অনেক ইঙ্গরেজ ঐতিহাসিক এখন নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া, কলঙ্কের মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক, এই ভূপতিদিগের পরলোকগত আত্মার সন্তৃপ্তিসাধনে প্রয়াস পাইতেছেন, কিন্তু এই যথেচ্ছাচারপরায়ণ অধিপতিগণের রাজত্বে, আমাদের দেশে যে সম্মোহন দৃশ্যের বিকাশ হইয়াছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, সুসভ্য ব্রিটিশ রাজত্বে সে দৃশ্যের আবির্ভাব হইতেছে না। তখন আমাদের সাহিত্যে, আমাদের কথপোকথনে, বিজাতীয় ভাবের আবির্ভাব হয় নাই। মাঞ্চেষ্টর তখন আমাদের লজ্জানিবারণের ভার গ্রহণ করে নাই; বার্ম্মিংহাম বা সেফীল্ড, লণ্ডন বা লিবরপুল, তখন আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসংগ্রহে তৎপর হয় নাই। যাঁহারা অমাদের সমক্ষে অত্যাচারী বলিয়া পরি-কীর্ত্তিত হইতেছেন, তাঁহাদের রাজত্বে আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম অক্ষত

ছিল। তখন আমাদের শিল্পদ্রব্য বা আমাদের সভ্যতার বলক্ষয় হয় নাই। এখন ইঙ্গলণ্ডের সাহিত্যচর্চ্চার জন্য অক্ষ্‌ফোর্ডের যেরূপ সমাদর, সমগ্র ভারতে তখন নবদ্বীপের তদপেক্ষা অধিক সমাদর ছিল। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দক্ষিণাপথ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানের ছাত্রেরা সংস্কৃত শিখিতে নবদ্বীপে আসিত, মুসলমানের রাজত্বে আমাদের শিল্পিগণ যে সমস্ত শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিত, অপক্ষপাত ঐতিহাসিক আজ পর্য্যন্ত তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন।

পাঠান রাজত্বের পর মোগল রাজত্বের সূত্রপাত হয়। ক্রমে মোগল সম্রাটের বিজয়পতাকা কাবুল হইতে গোলকুণ্ডা পর্য্যন্ত উড্ডীন হইতে থাকে। এ সময়েও আমাদিগকে পরমুখপ্রেক্ষী হইতে হয় নাই। এ সময়ে আমাদের শিল্পিগণ যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিত, আমরা তৎসমুদায়েরই ব্যবহার করিতাম। বিদেশেও ঐ সকল দ্রব্য আদরসহকারে পরিগৃহীত হইত। আমাদের ভাষাতেও, এ সময়ে, সর্ব্বাংশে জাতীয়ভাব প্রতিফলিত হইত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের সঙ্গীতাবলী, এ সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্য উজ্জ্বল করে। ভারতের মস্‌লিন প্রভৃতি, এ সময়েও, ইঙ্গলণ্ড ও ফ্রান্সের ভূপতিদিগকেও বিস্মিত করিয়া তুলে। ভারতীয় বিচিত্র কারুকার্য্য ও প্রাসাদাবলির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, এ সময়েও, ইউরোপীয় ভ্রমণকারীদিগের হৃদয় আকৃষ্ট করে। এ সময়ে ভারতের বীরপুরুষগণ যেরূপে বীরত্বকীর্ত্তির সম্মান রক্ষা করিতেন, শিল্পিগণ যেরূপ নৈপুণ্যসহকারে শিল্পকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, কবিগণ যেরূপ মধুরভাবে জাতীয় ভাবের পরিচয় দিতেন, অদ্যাপি ঐতিহাসিকগণ, আহ্লাদ ও প্রীতির সহিত তাহার বর্ণনা করিয়া থাকেন। রাজা মানসিংহ মোগলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত করিলেও স্বজাতিসমাজে সম্মানরক্ষায়

সমর্থ হয়েন নাই, মৌলবীগণের প্রাধান্যেও জাতীয় সাহিত্যের অবমাননা ঘটে নাই, এবং বিধর্ম্মী ও বিজাতির সংঘর্ষেও জাতীয় শিল্পের গৌরব অন্তর্হিত হইয়া-যায় নাই। মোগল রাজত্বে মিবার জাতীয় গৌরবে উন্নত ও জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মহান্ স্বার্থত্যাগের পরিচয় দেয়। যদি ইতিহাসের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করা যায়, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ জাতি বহু শতাব্দীর অত্যাচার সহিয়াও আপনাদের সভ্যতা অক্ষত ও আপনাদের জাতীয় গৌরবের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ এই উত্তর পাওয়া যাইবে, মিবারের রাজপুতগণই সেই অদ্বিতীয় জাতি। যুদ্ধের পর যুদ্ধে মিবার হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছে, অসির পর অসির আঘাতে রাজপুতের দেহ ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, বিজেতার পর বিজেতা আসিয়া আপনাদের সংহারিণী শক্তির পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু মিবার কখনও চিরকাল অবনত থাকে নাই। মানবজাতির ইতিহাসে কেবল মিবারের রাজপুতেরাই বিজেতার সহিত মিশিয়া, আপনাদের জাতীয় গৌরবে জলাঞ্জলি দেয় নাই। রোমকগণ ব্রিটনদিগের উপর আধিপত্য-স্থাপন করিলে, ব্রিটনেরা বিজেতার সহিত একবারে মিশিয়া যায়। তাহাদের পবিত্র বৃক্ষের সম্মান, তাহাদের পবিত্র বেদীর মর্য্যাদা, তাহাদের পুরোহিতগণের প্রাধান্য, সমস্তই অতীত সময়ের গর্ভে বিলীন হয়। মিবারের রাজপুতেরা কখনও এরূপ রূপান্তর পরিগ্রহ করে নাই। তাহারা অনেকবার ভূসম্পত্তি হইতে স্খলিত হইয়াছে, কিন্তু কখনও আপনাদের পবিত্র ধর্ম্ম বা পবিত্র আচারব্যবহার হইতে বিচ্যুত হয় নাই। ব্রিটিশ ভূমি যাহা দেখাইতে পারে নাই, জগতের ইতিহাসে মিবার তাহা দেখাইয়াছে।

মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশায়, ভারতে ইঙ্গরেজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঙ্গরেজ সৈন্যসামন্ত লইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন

নাই। ভারতবর্ষ ইঙ্গরেজের বিজয়লব্ধ সম্পত্তির মধ্যেও পরিগণিত নহে। ইঙ্গরেজ সামান্য বণিকের ভাবে, ক্রয়বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এদেশে উপনীত হয়েন, শেষে এতদ্দেশীয়ের সাহায্যে ভারতের রত্নসিংহাসন অধিকার করেন। ইঙ্গরেজ ভারতের আক্রমণকারী না হইলেও ভারতে সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। আয়তনে ও পরিমাণে, ইঙ্গরেজের ভারতসাম্রাজ্য মোগল সাম্রাজ্যকেও অধঃকৃত করিয়াছে। ভারতবর্ষীয়গণ যখন এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় ইঙ্গরেজের সহায় হয়, তখন তাহারা মনেও ভাবে নাই যে, ইঙ্গরেজের অধিকারে তাহাদিগকে সর্ব্বাংশে পরমুখপ্রেক্ষী হইতে হইবে। তাহা-দের গৃহকার্য্যের উপযোগী সামান্য বস্তুটির জন্যও ইঙ্গরেজের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে হইবে। ভারতবাসী তখন যাহার কল্পনাও করে নাই, যাহা তখন তাহাদের চিন্তার অগম্য ও ধারণার অতীত ছিল, এখন কার্য্যতঃ তাহাই ঘটিয়াছে। "খ্রীষ্টের ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে যখন পরাক্রান্ত জুলিয়স্ সীজর কয়েক সহস্র সৈনিক পুরুষ লইয়া ব্রিটে-নিয়ার উপকূলে উপনীত হয়েন, তখন তিনি ইহা দেখিয়াই নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন যে, যাহাদের সহিত তাঁহার যুদ্ধের আয়োজন হইয়াছে, তাহারা অর্দ্ধমনুষ্য ও অর্দ্ধপশু। অপক্ক মাংস তাহাদের আহারীয়, ভূগর্ত্ত বা ভূগর্ত্তের ন্যায় মৃণ্ময় কুটীর তাহাদের আবাসগৃহ, তরুশাখা তাহাদের বিনোদক্ষেত্র, তাহাদের দেহ বিবিধ বর্ণে চিত্রিত এবং তাহাদের ভাষা বিকটশব্দের ন্যায় শ্রুতিকঠোর। আর যখন বীরচূড়ামণি সেকে-ন্দর শাহ, জুলিয়স্ সীজেররও প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে, পারস্য হইতে পঞ্চনদের পবিত্র ভূমিতে সমাগত হয়েন, তখন তিনি ও তদীয় সহচর-বর্গ ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, তাঁহারা স্বদেশে থাকিয়া, যাহা-দিগকে একপ্রকার অসভ্য মনে করিতেন, তাঁহারা সভ্যতায় গ্রীক-দিগেরও শিক্ষাগুরু। তাঁহারা রূপে অতুল্য ও বীরত্ব, দয়া, দাক্ষিণ্য

প্রভৃতিগুণে বিভূষিত, তাহাদের সুরম্য সৌধসমাকীর্ণ নগর বিবিধ ভোগ্য বস্তুতে পরিপূর্ণ, তাহাদের আচারব্যবহার সর্ব্বথা পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত এবং তাহাদের ভাষা মন্দাকিনীর মৃদুতরঙ্গভঙ্গীজন্য কলনাদের ন্যায় শ্রুতিমধুর ও মনোমদ *।" গ্রীক পণ্ডিতগণ ইহা দেখিয়া হিন্দুদিগকে আপনাদের শিক্ষাগুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। হিন্দুর সভ্যতা, হিন্দুর বিজ্ঞান, হিন্দুর দর্শন, ক্রমে গ্রীসে প্রচারিত হয়। বহু শত বৎসর পরে, ঐ জ্ঞানালোক অসভ্যভূমি ইঙ্গলণ্ড আলোকিত ও সভ্যতার শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। সেকন্দর শাহের আক্রমণে এইরূপে ভারতের সহিত ইউরোপের সংযোগ ঘটে। কে ভাবিয়াছিল, এই সংযোগে বহুযুগের পর ভারতের দশাবিপর্য্যয় ঘটিবে? যাহারা অমানুষভাবে জুলিয়স্ সীজরের বিস্ময় জন্মাইয়াছিল, কে ভাবিয়াছিল, তাহারা বহুযুগের পর সভ্যতাসম্পন্ন শ্রীসম্পন্ন ও শক্তি-সম্পন্ন হইয়া, সভ্যতাজননী ভারতভূমির ভিক্ষাদাতা হইয়া উঠিবে? আর যাহারা এক সময়ে আচারব্যবহারে, ধনসম্পত্তিতে, শিল্পবিজ্ঞানে, গ্রীক-দিগেরও বরণীয় ছিল, কে ভাবিয়াছিল, তাহারাই এখন জাতীয়ভাবে জলাঞ্জলি দিয়া, গ্রীসের শিষ্যস্থানীয় রোমের নির্জ্জিত, সেই ব্রিটিশ জাতির দ্বারে সর্ব্ববিষয়ে ভিক্ষাপ্রার্থী হইবে? কালের পরিবর্ত্তনে দুইটি বিভিন্ন জাতি এখন এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এক জাতির কিছুতেই তৃপ্তি হয় না, কিছুতেই সন্তোষ জন্মে না, এবং কিছুতেই ক্রিয়ার বিরতি ঘটে না। আর এক জাতির নিয়তই তৃপ্তি ও নিয়তই ক্রিয়ার বিরতি। সুতরাং এক জাতি নিত্য ক্রিয়ান্বিত, উদ্যমসম্পন্ন ও চিরনিদ্রাহীন, আর এক জাতি ক্রিয়াশূন্য, আলস্যমগ্ন ও চিরনিদ্রাভিভূত। ইঙ্গরেজ এখন কর্ম্ম-শীলতায় শ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিয়াছেন। হিন্দু এখন কর্ম্মহীনতায় ইঙ্গরে-জের দোষরাশির অনুকরণ করিয়া, পূর্ব্বতন গৌরব বিস্মৃত হইয়াছেন।

* তৃতীয় খণ্ড বান্ধবের ব্রিটিশইণ্ডিয়া শীর্ষক প্রবন্ধ।

অনুকরণশূন্যতা ও একতা না হইলে, জাতীয় ভাবের পরিপুষ্টি হয় না। আমাদের জাতীয় ভাবের অবনতির প্রধান কারণ, অনুকরণ-প্রবণতা ও অনৈক্য। এ অংশে আমিরা যতদূর অধঃপতিত হইয়াছি, পাঞ্জাবী, হিন্দুস্থানী বা মহারাষ্ট্রীয় ততদূর হয়েন নাই। আমাদের পরিচ্ছদে, আচারব্যবহারে, ভাষায়, নিয়তই বৈষম্য রহিয়াছে। পরিচ্ছদে জাতীয় ভাবের পরিচয় হইয়া থাকে। প্রত্যেক জাতিরই এক একটি নির্দ্দিষ্ট পরিচ্ছদ আছে। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী জাতির এরূপ পরিচ্ছদসাম্য নাই। আমরা বিভিন্ন পরিচ্ছদে দেহ সজ্জিত করিয়া, হীন অনুকরণের প্রাধান্যরক্ষায় যত্নশীল হই। কোনও মজ্‌-লিসে উপস্থিত হইলেই বাঙ্গালীর পরিচ্ছদবৈচিত্র্য দৃষ্টিগোচর হয়। যে স্থলে এরূপ বৈষম্য, সেস্থলে জাতীয়ভাব রক্ষিত হইতে পারে না। এখন আমাদের মধ্যে অনেকেই বিলাতে যাইতেছেন। যাঁহারা বিলাত-যাত্রা করেন, প্রায় তাঁহারাই হ্যাট্ কোট্ পরিয়া, সাহেবী চালচলন শিখিয়া, আমাদের সমক্ষে কিম্ভূতকিমাকার জীবরূপে আবির্ভূত হয়েন। আচারে, পরিচ্ছদে, কার্য্যে, কথাবার্ত্তায়, কিছুতেই তাঁহাদের সহিত আমাদের সমতা থাকে না। তাঁহারা মিল ও বেন্থাম গলাধঃ-করণ করিয়াও, নিরবচ্ছিন্নভাবে বৈষম্যনীতিরই পরিচয় দেন। তাঁহারা সেই সাহেবী সাজে সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া, জলদগম্ভীর স্বরে স্বদেশহিতৈষিতার গৌরবঘোষণা করেন, এবং ম্যাট্‌সিনি ও গারিবল্‌-দির নামোল্লেখ করিয়া, স্বদেশীয়ের হৃদয়ে তাড়িতপ্রবাহ সঞ্চারিত করিতে প্রয়াসবান্ হয়েন। কিন্তু তাঁহারা আপনারাই যে, স্বদেশ ও স্বজাতি হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহা একবারও মনে করেন না। তাঁহাদের আরাধ্য ম্যাট্‌সিনি বা গারিবলদি যদি বিজাতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত ও বিজাতীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, বিজাতীয় ভাষায় আলাপ করিতেন, তাহা হইলে, ইতালির উদ্ধার হইত কি না, তাহা তাঁহাদের কুশাগ্র

বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না। তাঁহাদের হিতৈষিতা থাকিতে পারে, ভূয়োদর্শন থাকিতে পারে, কার্য্যপটুতা থাকিতে পারে, কিন্তু একমাত্র বৈষম্যবুদ্ধির বিপত্তিপূর্ণ তরঙ্গাঘাতে, তৎসমুদয়ই বিজাতীয় ভাবের অতল সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত রাজনারায়ণ বসু, তাঁহার "একাল আর সেকাল" নামক উপদেশপূর্ণ গ্রন্থে এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, আমি এই স্থলে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—"আমরা সকল বিষয়েই সাহেবদের অনুকরণ করিতে ভালবাসি, কিন্তু বিবেচনা করি না যে, সে অনুকরণ আমাদের দেশের উপযোগী কি না, আর তদ্দ্বারা আমাদের দেশের প্রকৃত উপকার সাধিত হইবে কি না? সাহেবেরা পর্য্যন্ত, যে সাহেবী প্রথা এদেশের উপযোগী নহে, মনে করেন, তাহাও আমরা অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হই না। সাহেবেরা নিজে বলিয়া থাকেন, সাহেবী পোশাক কোনও মতে এদেশের উপযুক্ত নয়; কিন্তু আমাদের দেশের কোনও কোনও ব্যক্তি ঐ পোশাক ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না। আমাদের দেশের কোনও বিখ্যাত ব্যক্তি ভূতপূর্ব্ব লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর বীডন সাহেবের সহিত ধুতি চাদর পরিয়া দেখা করিতে যাইতেন। তাহাতে গবর্ণর সাহেব বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। একবার গ্রীষ্মের সময় দেখা করিতে গিয়াছেন, গিয়া দেখেন যে, গবর্ণর সাহেব ঢিলে পাজামা ও পাতলা কামিজ পরিয়া বসিয়া আছেন। আমাদের বন্ধুকে দেখিবামাত্র তিনি বলিলেন, 'তোমাকে দেখিয়া আমার হিংসা হচ্ছে, ইচ্ছা করে তোমাদের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিয়া থাকি।' আমাদের বন্ধু উত্তর করিলেন, 'তাই কেন করুন না?' বীডন সাহেব বলিলেন, 'ওরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করা আমাদের দেশাচারবিরুদ্ধ, সুতরাং কেমন করিয়া করি!' আমাদের বন্ধু উত্তর করিলেন, 'আপনাদের বেলা দেশাচার বলবৎ, আর আমাদের বেলা কিছুই নহে, আপনারা এরূপ

বিবেচনা করেন কেন ?” আমাদের দেশের শীর্ষস্থানীয়, এই সদাশয় মহাপুরুষ গবর্ণরের সমক্ষে যেরূপ স্বাধীনভাবে জাতীয় রীতি রক্ষা করিয়াছিলেন, তদনুরূপ আচরণ করা আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহারের ন্যায়, সাহিত্যে, শিক্ষায় ও কথাবার্ত্তা প্রভৃতিতে জাতীয়ভাব পরিস্ফুট হইয়া থাকে। কিন্তু এ বিষয়েও আমাদের মধ্যে নানারূপ বিড়ম্বনা দেখা যায়। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, হরুঠাকুর, রামবসু, ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতির রচনা কেমন সুন্দর ও সহৃদয়তার উদ্দীপক। পড়িবামাত্র তাহা বাঙ্গালীর বিশুদ্ধ সম্পত্তি বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে বিজাতীয়ভাবের আবিলতা নাই, বিজাতীয় ভাষার কুটিল বিভ্রম নাই এবং বিজাতীয় সভ্যতার বিচিত্র আবেশ নাই। তাহা প্রসন্নসলিলা জাহ্নবীর জলপ্রবাহের ন্যায় নিয়তই স্বচ্ছ, নিয়তই আবিলতাবর্জ্জিত ও নিয়তই জীবনতোষিণী। ইদানীন্তন কবিগণের রচনায়, সেরূপ সহৃদয়তা বা সেরূপ বিশুদ্ধির অভাব দৃষ্ট হয়। ইদানীন্তন গ্রন্থকার ইঙ্গরেজীতে শিক্ষিত ও ইঙ্গরেজীভাবে অনুপ্রাণিত, সুতরাং তাঁহার রচনাও ইঙ্গরেজীর গন্ধবিস্তার করে। জাতীয় সাহিত্যের সম্যক্ অনুশীলন না হইলে ইহার প্রতীকার হইবে না। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায়, ইঙ্গরেজী অনুবাদের প্রশ্নে, যেরূপ অপূর্ব্ব বাঙ্গালার সৃষ্টি হইতেছে, আমাদের জাতীয় ভাষার কিরূপ অসম্মান ঘটিতেছে, তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হইবে। কোনও স্বাধীন দেশে, মাতৃভাষার এরূপ অবমাননা ঘটিলে,—অপরের সমক্ষে মাতৃভাষা এরূপ উপহাসাস্পদ হইলে, তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইত। মাতা ও মাতৃভাষা, উভয়ই সমান আদর, সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারিণী, মাতার স্তন্যে যেরূপ আমরা পরিপুষ্ট ও মাতার স্নেহে যেরূপ আমরা পরিবর্দ্ধিত হই, জাতীয় ভাষার গুণে সেইরূপ আমাদের জাতীয় ভাবের উন্মেষ হয়। মাতা আমাদিগকে মানুষ

করেন, জাতীয় ভাষা আমাদিগকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে লইয়া যায়। মাতার অসম্মান ও জাতীয় ভাষার অসম্মান, উভয়ই তুল্য। উভয়ই অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হইলে, জাতীয় গৌরববৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে না। এজন্য, পিতৃভাষা সংস্কৃতের সহিত মাতৃভাষা বাঙ্গালার আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

যে শিক্ষায় স্বজাতিপ্রেমের বিকাশ ও স্বজাতিপ্রিয়তার গৌরববৃদ্ধি না হয়, সে শিক্ষায় জাতীয় ভাব পরিপুষ্ট হয় না। এখন কোমলমতি বালকেরা ইঙ্গরেজী পড়িতে বসিয়া, কেবল বিদেশীভাবেরই দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করে। ডুবাল বা রস্কো তাঁহাদের অধ্যবসায় বা সহিষ্ণুতাশিক্ষার প্রথম পথপ্রদর্শক হয়েন, ওয়েলিংটন বা ওয়াসিংটন তাঁহাদের সমক্ষে বীরত্বজ্ঞানবিকাশ করেন, লুথর বা জেবিয়ার তাহাদিগকে ধার্ম্মিক হইতে শিক্ষা দেন। রঘুনাথ বা জগন্নাথ যে, তাহাদের অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতাশিক্ষার আদর্শ; প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্য যে, তাহাদের বীরপুরুষ; বুদ্ধ বা চৈতন্য যে, তাহাদের ধর্ম্মপ্রচারক, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় না। পূজনীয় আর্য্য পিতৃপুরুষের অবদান-পরম্পরার আলোচনা করিলে যে, দেশভক্তি, স্বজাতিপ্রীতি এবং আত্মাদর ও আত্মসম্মানের আবির্ভাব হয়, শিক্ষার্থীরা, বাল্যকাল হইতেই তাহাতে বঞ্চিত থাকে। এইরূপ উদাসীন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদের মানসিক ভাবও ঔদাসীন্যে পূর্ণ হয়। চীন যে অদ্যাবধি চীনই আছে, ইউরোপ বা আমেরিকায় পরিবর্ত্তিত হয় নাই, জাতীয় ভাবের শিক্ষাই তাহার প্রধান কারণ। চীন আধুনিক সভ্যসমাজে অবজ্ঞাত হইতে পারে, কিন্তু এক সময়ে চীনের পরিব্রাজক, চীনের ধর্ম্মপ্রচারক ও চীনের শিল্পকারক যে শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, অদ্যাপি চীন সেই পথে অটল রহিয়াছে। জাতীয়ভাবমূলক শিক্ষা না হইলে, চীন এরূপ অটলতার পরিচয় দিতে পারিত না।

আমাদের কথোপকথনেও হীন অনুকরণ পরিদৃষ্ট হয়। যাঁহারা জন্মান্তরীণ সুকৃতির বলে যৎসামান্য ইঙ্গরেজী শিখিয়া, আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন, তাঁহারাও কথাবার্ত্তায় বার আনা ইঙ্গরেজী শব্দ ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারেন না। ইহা যে, তাঁহাদের জাতীয়ভাবশূন্যতা ও হীন অনুকরণের পরিচয়, তাহা তাঁহারা মনেও ভাবেন না। এসম্বন্ধে রাজনারায়ণ বাবুর একাল আর সেকালে এইরূপ উপদেশগর্ভ কথা লিখিত হইয়াছে ঃ—"আমরা এক্ষণে যেরূপ কথা কহি, তাহা শুনিলে ইংরেজেরা কিংবা অন্য কোনও বিদেশীয় লোক হাস্য না করিয়া থাকিতে পারে না, সেকালের লোক কৌতুকের জন্য ইংরাজী বাঙ্গালা শব্দ মিশাইয়া ছড়া প্রস্তুত করিতেন। যথা,—

'শ্যাম Going মথুরায়, গোপীগণ পশ্চাৎ ধায়,
বলে your okroor uncle is a great rascal।'

আমরা কৌতুকের জন্য নহে, গম্ভীরভাবে ঐরূপ ভাষায় কথা কহি। কিন্তু আমরা নিজে বুঝিতে পারি না যে, তাহা কতদূর হাস্যাস্পদ। 'আমার father yesterday কিছু unwell হওয়াতে Doctor কে call করা গেল, তিনি একটি physic দিলেন। physic বেস্ operate করে ছিল, four five times motion হোলো, অদ্য কিছু better বোধ কোচ্চেন।' এ বিড়ম্বনা কেন? সমস্তটা বাঙ্গালায় না বলিতে পার, কেবল ইংরেজিতে বল না কেন? তাহা অপেক্ষাকৃত ভাল। কোনও কোনও স্থলে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার না করিলে চলে না; যথা ডেস্ক, বেঞ্চ, টাউনহল, গবর্ণরজেনেরল প্রভৃতি। কিন্তু যে স্থলে বাঙ্গালা শব্দ অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে, সে স্থলে ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা অন্যায়। যাঁহারা ইংরেজী কিছু জানেন না, ইংরেজী ভাষাজ্ঞতা জানাইবার জন্য, তাঁহারা বাঙ্গালার সঙ্গে আরো ইংরেজী শব্দ মিশাল করিয়া বলেন। * * ইংরেজী গ্রন্থকর্ত্তা সদি (Southey)

বলিয়াছেন, 'আমাদিগের ভাষা অতি মহৎ ভাষা, অতি সুন্দর ভাষা। ইংরেজী ও জর্ম্মাণ ভাষার পরস্পর জ্ঞাতিত্ব অনুরোধে জর্ম্মাণভাষোৎপন্ন শব্দ ব্যবহার আমি ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু যেখানে একটি খাঁটি ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে, সেখানে যে ব্যক্তি লাতিন অথবা ফ্রেঞ্চ শব্দ ব্যবহার করে, মাতৃভাষার প্রতি বিদ্রোহাচরণজন্য তাহাকে ফাঁসি দিয়া, তাহার শরীর খণ্ডবিখণ্ড করা উচিত।' 'যাঁহারা বাঙ্গালা কথোপকথনের সময় ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করেন, তাঁহাদের একবারে এরূপ উৎকট দণ্ড না করিয়া, প্রথমে একটি ভদ্র উপায় অবলম্বন করিলে ভাল হয়। যদি দেখা যায়, ভদ্রতায় কিছু হইল না, শেষে সদিবিহিত দণ্ড আছে। সে ভদ্র উপায় এই,—যখন কেহ ইংরেজী মিশাইয়া কথা কহিবেন, তখনই বলা যাইবে 'ভাষায় আজ্ঞা হউক।' এ বিষয়ে একটি গল্প আছে। এক ব্রাহ্মণের একটি শ্যামা প্রতিমা ছিল। সেই শ্যামা দেবীমূর্ত্তি তাঁহার উপজীবিকার একমাত্র উপায় ছিল। লোকে সেই ঠাকুরাণীর পূজা দিত, তাহাতে তাঁহার গুজরাণ হইত। একদিন তিনি গাঁজাটি টেনে দেবালয়ের দ্বারে বসিয়া আছেন, মনে হইল, দেবী ঘরের ভিতর হইতে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। দেবতারা কখনই ভাষায় কথা কহেন না, দেববাণী সংস্কৃতেই কথা কহিয়া থাকেন; তিনি ত সংস্কৃত জানেন না, অতএব দেবীকে বলা হইল, 'মা! আমি অতি মূঢ়; ভাষায় আজ্ঞা হউক।' এই 'ভাষায় আজ্ঞা হউক' কথাটা আমাদিগকে শিখিয়া রাখিতে হইবে। ইংরেজী শব্দ মিশাইয়া, কেহ বাঙ্গালা বলিলেই ঐ কথা বলিতে হইবে।" আমি প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বাবুর উৎকৃষ্ট উপদেশ সমস্ত উদ্ধৃত করিলাম। এই উপদেশ মনে না রাখিলে আমাদের জাতীয় ভাবের উন্মেষ হইবে না।

কেবল কথোপকথনে নয়, চিঠিপত্র লিখিতেও এক্ষণে ইঙ্গরেজীর

ছড়াছড়ি হয়। স্বদেশীয় পত্র লিখিতে, যে স্থলে স্বদেশীয়কে ভাষার ব্যবহার করিলে চলে. সে স্থলে বিদেশীয় ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা জাতীয়গৌরবের লক্ষণ নয়। অনেকে আবার আপনাদের নাম পর্য্যন্ত ইঙ্গরেজের নামের আকারে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহারা ধুতি চাদর ছাড়িয়া হ্যাট কোট ধরিয়াছেন। সুতরাং হেমেন্দ্রনাথ মিত্রও এক্ষণে H. N. Mitterএ পরিণত হইয়াছেন। জাতীয়ভাবেব অধোগতি এইরূপে আমাদের প্রতি কার্য্যে পরিস্ফুট হইতেছে। বিজাতীয় শিক্ষা, যেমন আমাদিগকে ধীরে ধীরে বিজাতীয়ভাবে সংগঠিত করিতেছে, বিজাতীয় পদ্ধতি সেইরূপ আমাদের অন্তঃপুর-চারিণী মহিলাদিগকেও বিজাতীয়ভাবে পরিণত করিয়া তুলিতেছে। অবলা চিরদিনই প্রীতির পুত্তলী, এবং অবলা চিরদিনই কোমল হৃদ-য়ের কোমলতর গুণে আরাধ্যা দেবী। কিন্তু বিজাতীয়ভাবমূলক-শিক্ষায়, আমাদের অবলাগণের কোমলতার গুণ সকল অন্তর্হিত হইতেছে; তৎপরিবর্ত্তে পুরুষোচিত কঠোর গুণ সকলই স্থান পরি-গ্রহ করিতেছে। তাঁহাদের নামগুলি পর্য্যন্ত বিকৃত হইয়া বিজাতীয় ভাবের প্রাধান্যঘোষণা করিতেছে। এখন কুমুদিনী কারফরমা, বিনোদিনী বটব্যাল, ভবসুন্দরী ভট্টাচার্য্য, রত্নমণি রায়, গঙ্গামণি গঙ্গোপাধ্যায়, আমাদের সম্মুখে নিরন্তর বিভীষিকাময়ী ছায়াবিস্তার করিতেছেন। কোমলতাময়ী কামিনীগণের কমনীয় নামগুলির এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিলে কাহার হৃদয়ে বেদনা বোধ না হয়? এইরূপ নামে স্ত্রী, কি পুরুষ, অনেক সময়ে তাহারই নিরূপণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। স্ত্রীশিক্ষার এইরূপ শোচনীয় পরিণাম,—জাতীয়ভাবের এইরূপ শোচনীয় অধঃপতন, আমাদের দেশে কখনও ঘটে নাই। যে অবলা জাতীয়ভাবে পরিচালিত ও জাতীয় শিক্ষার অনুবর্ত্তিনী হয়েন, তিনি ভূলোকে থাকিয়াও স্বর্গস্থিতা দেবী বলিয়া পূজিতা হইয়া থাকেন,

এবং এই রোগশোকময়—এই পাপতাপজর্জ্জরিত সংসারে, জীবন-তোষিণী শান্তির অমৃতময়ী ধারায় সকলকে সন্তৃপ্ত করেন। বর্ত্তমান সময়েও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। স্বর্গীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরীর পবিত্র নাম আমাদের জাতীয় গৌরবের বিষয়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। শরৎসুন্দরী অল্পবয়সেই পতিহীনা, কঠোরব্রহ্মচর্য্যপরায়ণা তপস্বিনী; প্রভূত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াও, চিরকাল বিষয়বাসনাপরিশূন্যা, পবিত্রতাময়ী মহাদেবী। আধুনিক নারীসমাজে যাহা শিক্ষা বলিয়া অভিহিত হইতেছে, সে অংশে শরৎসুন্দরী অশিক্ষিতা হইতে পারেন, কিন্তু আধুনিক শিক্ষাভিধানে এই অশিক্ষিতা রমণী পবিত্র চরিত্রে, গভীর হিতৈষিতায়, অপূর্ব্ব ধর্ম্মাচরণে, যেরূপ অশান্তির মধ্যে শান্তির রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা সমগ্র সভ্যসমাজের সমগ্র সুশিক্ষিতা রমণীরও অনুকরণীয়।

ফলতঃ, সকল বিষয়েই বিজাতীয় ভাবের অনুকরণ করিলে যেরূপ জাতীয়ভাব বিনষ্ট হয়, সেইরূপ বলবীর্য্যেরও হানি হইয়া থাকে। যাহা আমাদের জাতীয় প্রকৃতির সহিত সমঞ্জসীভূত, আমাদের তদনুসারেই চলা কর্ত্তব্য। আমাদের জাতীয় রীতি অনুসারে যে সকল ব্যায়াম ছিল, এখন তৎসমুদয়ের বিলোপ হইয়াছে, আমাদের মহিলাগণ পূর্ব্বে শ্রমশীলা ছিলেন, আধুনিক শিক্ষায়, ইদানীন্তন সময়ে মহিলারা বিলাসিনী হইয়া পড়িতেছেন। প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে,—অনুকরণের হীনতায় আমাদের দিন দিন অধোগতি হইতেছে। সমাজহিতৈষী সংস্কারক, ললাটফলক আকুঞ্চিত করিয়া, বিস্ফারিত-নেত্রে গম্ভীরভাবে কহিতেছেন, বাল্যবিবাহ সমস্ত দোষের আকর। এই জন্য ভারতবাসীর বলবীর্য্যের অপচয় ঘটিতেছে। ইঙ্গরেজ বাল্য-বিবাহের দোষকীর্ত্তন করিতেছেন, সংস্কারকও তদনুকরণে যৌবন-বিবাহের গৌরবঘোষণায় প্রবৃত্ত হইতেছেন। যখন আমাদের দেশে

ইঙ্গরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, আম্মাদের সমাজে ইঙ্গরেজী সভ্যতা গতি প্রসারিত করে নাই, আমাদের অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, ইঙ্গরেজের রীতি নীতি প্রবিষ্ট হয় নাই, তখনও আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। বাল্যবিবাহের প্রতি এখন যে দোষের আরোপ করা হইতেছে, তখন সে দোষের ফল প্রত্যক্ষীভূত হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে, যখন প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাট আকবর শাহ, ভারতের উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে বিজয়িনী শক্তি বদ্ধমূল করিতেছিলেন, "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনি যখন শতসহস্র কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইতেছিল, দুই এক দল ইউরোপীয় বণিক যখন ভারতের এক প্রান্তে, সামান্য বিপণীর মধ্যে, ক্ষতিলাভের গণনা করিতেছিল, ভারতবর্ষ যখন হিন্দুর মন্ত্রণায় পরিচালিত ও হিন্দুর বাহুবলে রক্ষিত হইয়া স্ব-তন্ত্র শাসননীতির মহিমার পরিচয় দিতে ছিল, তখন সুদূর দক্ষিণাপথে মালজী ভোঁসলা-নামক একজন সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়ের শাহজীনামে একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। শাহজীর বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন একদা মালজী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, দোলের উৎসবে যদুরাওনামক একজন মহারাষ্ট্রীয়-প্রধানের ভবনে গমন করেন। যদুরাওর জিজিবাই নামে একটি তিন বৎসরের দুহিতা ছিল। বালিকা প্রফুল্লচিত্তে পঞ্চবর্ষীয় শাহ-জীর সহিত আবির খেলিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সূত্রে, উভয়ের পিতা, উভয়ের মধ্যে পরিণয়সম্বন্ধ স্থির করেন। চারি বৎসর পরে, অর্থাৎ দশমবর্ষীয় শাহজীর সহিত, অষ্টমবর্ষীয়া জিজিবাইর বিবাহ হয়। এই বিবাহে সে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহার বীরত্বে ও তাহার পরাক্রমে, দুর্জ্জয় মোগল সাম্রাজ্যও বিচলিত হয়। ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট আরঙ্গজেবও তাঁহার লোকাতীত ক্ষমতার নিকট মস্তক অব-নত করেন। বাল্যবিবাহের ফল,—প্রাতঃস্মরণীয় শিবজী, হিন্দুজয়ী

মুসলমানের মধ্যে স্বাধীন হিন্দুরাজত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া বীরেন্দ্রসমাজের বরণীয় হয়েন। ইহার একশতাব্দী পরে, ভারতের উত্তর প্রান্তে, পঞ্চনদের বিশাল ক্ষেত্রে, আর একটি মহাশক্তির আবির্ভাব হয়। ব্রিটিশসিংহের সমক্ষে, পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ পঞ্জাবের স্বাধীন ভূপতি বলিয়া গৌরবান্বিত হয়েন। যখন রণজিৎ সিংহের জন্ম হয়, তখন তাঁহার পিতা মহাসিংহের বয়স কুড়ি বৎসর। মহাসিংহের অপূর্ণযৌবনে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার অতুল্য বীরত্বকীর্ত্তি ইতিহাসের পত্রে পত্রে বিরাজ করিতেছে। লর্ড অক্‌লণ্ডের সময়ে কাবুলে ইঙ্গরেজ সৈন্যের যেরূপ দুর্গতি হয়, তাহা ইতিহাস-পাঠকের অবিদিত নাই। কূর্দ্দকাবুল গিরিসঙ্কটে, আফগানদিগের আক্রমণে ইঙ্গরেজের ক্ষমতা বিনষ্ট ও ইঙ্গরেজের বহুসৈন্য অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হয়। বীরত্বাভিমানী ইঙ্গরেজের পরাক্রম যেস্থলে বদ্ধমূল হয় নাই, বাল্যবিবাহোৎপন্ন রণজিতের পরাক্রমে সেই স্থলে বিজয়পতাকা স্থাপিত হয়। সিন্ধুনদের অপর পারে, নওশেরার যুদ্ধক্ষেত্রে, পঞ্জাবকেশরী আফগানদিগকে পরাজিত করেন। ভারতের যে দুইটি বীরপুরুষ সমগ্র বীরেন্দ্রসমাজে শ্রদ্ধা ও প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইতেছেন, ব্রিটিশ ঐতিহাসিকও যাঁহাদিগকে পৃথিবীর মহৎলোকের শ্রেণীতে সমাবেশিত করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়েই বাল্যবিবাহের ফল। মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাব ছাড়িয়া, এই অধঃপতিত, বিনষ্ট-সর্ব্বস্ব, নিপীড়িত ও নির্জ্জিত বাঙ্গালার বিষয় বিবেচনা করুন। রাজা প্রতাপাদিত্যের বীরত্বে, দিল্লীর সেনাপতি মানসিংহও চমকিত হইয়াছিলেন। সীতারাম রায়ের সাহস, পরাক্রম ও অপূর্ব্ব অস্ত্র-প্রয়োগনৈপুণ্যের বিবরণ শুনিয়া, দিল্লীর তদানীন্তন ভূপতি ফররোখশেরও বিস্ময়প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য ও সীতারামের সময়ে, বাঙ্গালায় যৌবনবিবাহ প্রচলিত ছিল না। নবাব

সিরাজউদ্দৌলা এখন ইতিহাসে দুর্ব্বৃত্ত ও নৃশংস বলিয়া ধিক্কৃত হইতেছেন। অপরিপক্কমতি, অষ্টাদশবর্ষীয় যুবকের চরিত্র এখন অনন্ত কলঙ্ককালিমায় আচ্ছন্ন হইতেছে। কিন্তু এই যুবকের রাজত্বে বাঙ্গালীর যেরূপ ক্ষমতা, যেরূপ সাহস ও যেরূপ প্রাধান্য ছিল, সুসভ্য ব্রিটিশ রাজত্বে তাহার কিছুই পরিদৃষ্ট হইতেছে না। ইঙ্গরেজ এখন যৌবনবিবাহের পক্ষপাতী। কিন্তু প্রাচীন সময়ে তাঁহাদের দেশেই অল্পবয়সে বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বে ইঙ্গলণ্ডে, সাধারণতঃ দ্বাদশবর্ষে বালিকাদের বিবাহ হইত। যখন সপ্তম হেন্‌রির জন্ম হয়, তখন তাঁহার মাতা লেডী মারগারেটের বয়স চৌদ্দ বৎসরেরও কম ছিল। ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংসের পিতা পঞ্চদশবর্ষে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েন। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হইতে পারে। বাল্যবিবাহে সে সময়ে ইঙ্গরেজের বলবীর্য্যের হানি হয় নাই। ইতিহাস সে সময়ের ইঙ্গলণ্ডকে কাপুরুষের আবাসভূমি বলিয়াও পরিচিত করে নাই।

এইরূপে, ইঙ্গরেজের দেখাদেখি, আমরা আমাদের জাতীয় রীতি নীতির সকল অংশেই দোষ দেখিতেছি। ইঙ্গরেজের সবই ভাল, আর আমাদের সবই মন্দ, এইরূপ ধারণাই আমাদের জাতীয় ভাবের অধোগতির মূল হইয়াছে। আমরা যদি ইঙ্গরেজের একতা, উদ্যম, উৎসাহ প্রভৃতি গুণের অনুকরণ করিতাম, তাহা হইলে আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত না। কিন্তু আমরা অতি হীন অনুকরণে প্রবৃত্ত হইতেছি। আমাদের নিকট ইঙ্গরেজের বাহ্য ভঙ্গীরই আদর হইতেছে। আমাদের তুলা ও পাট ইঙ্গলণ্ডে যাইতেছে, সেস্থানে কাপড় প্রস্তুত হইয়া আমাদের লজ্জা নিবারণ ও শীতাতপ হইতে দেহরক্ষা করিতেছ। তাঁতী তাঁত ছাড়িয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করি-য়াছে। কর্ম্মকার জাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া উদরান্নের

জন্য হাহাকার করিতেছে। যাঁহারা পৃথিবীবিখ্যাত ঢাকাই মস্‌লিন প্রস্তুত করিতেন, এখন তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থেই তদীয় সন্তানগণের দিনপাত হইতেছে। আমরা কাঞ্চন ফেলিয়া কাচের আদর করিতেছি, স্বদেশের খাঁটি জিনিসের পরিবর্ত্তে আমাদের নিকট বিদেশের আপাতসৌন্দর্য্যময় দ্রব্যেরই সম্মান হইতেছে। সম্রাট আরঙ্গজেবের সময়ে, একজন ফরাসী ভ্রমণকারী, অনেকদিন এতদ্দেশে বাস করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়া গিয়াছেন ঃ—"বাঙ্গালার অনেক স্থান মিশরদেশ অপেক্ষাও উর্ব্বর। এই দেশে অপর্য্যাপ্ত ধান্য, তূলা, নীল ও রেসম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষের অনেক স্থানই বহু লোকাকীর্ণ। শিল্পিগণ শাল, গালিচা, রেসম ও সূতার কাপড় প্রভৃতি প্রস্তুত করে। এই সকল বাণিজ্য দ্রব্যের বিনিময়ে পৃথিবীর অনেকস্থান হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য আসিয়া ভারতবর্ষে জমা হয়। ভারতবর্ষীয়েরা অপরদেশোৎপন্ন দ্রব্য অধিকপরিমাণে ব্যবহার করে না। সুতরাং, এই স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রায় সমস্তই, অন্যত্র না গিয়া, ভারতবর্ষে থাকিয়া যায়। এজন্য, অতি সামান্য অবস্থার লোকেও স্ত্রী কন্যাদিগকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার দিয়া থাকে। * * * বঙ্গদেশ শস্যসম্পত্তিপূর্ণ। যে স্থানে যাওয়া যায়, সেই স্থানেই ইহার শ্যামল শোভা দেখিয়া নেত্র পরিতৃপ্ত হয়। এই দেশে এত ধান্য জন্মে যে, তদ্দ্বারা সমস্ত বাঙ্গালার ও অন্যান্য অনেক দেশের লোকের ভরণপোষণনির্ব্বাহ হয়। বাঙ্গালার চিনি, তূলা, রেসম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়া থাকে। * * রাজমহল হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত, গঙ্গার দুই দিকে বহুসংখ্যক খাল দেখা যায়। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য, ঐ সকল খাল কাটা হইয়াছে। খালের উভয়পার্শ্বে লোকাকীর্ণ নগর, পল্লী ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র আছে। যতবার দেখা যায়, ততবারই ঐ সকল দৃশ্য নয়নের অনির্ব্বচনীয় প্রীতিসম্পাদন করে।" কিন্তু

এখন আর এই সুন্দর দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা এখন ইতিহাসের কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সম্পত্তিসম্পন্না, শস্যশ্যামলা ভূমি, আজ ব্রিটিশবাণিজ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। লোকবিশ্রুত পবিত্র সমাজ আজ ব্রিটিশ রীতিনীতি, ব্রিটিশ আচারব্যবহারের বিহারক্ষেত্র। পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ও পূর্ব্ব গৌরবে মহিমান্বিত জনগণ, আজ ব্রিটিশ সিংহের দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী। প্রলয়পয়োধির জলোচ্ছ্বাসে সে গৌরব, সে মহত্ত্বের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যে এক সময়ে অপরের অভাবমোচন করিত, সে আজ আপনার অভাবে আপনিই দিশাহারা হইয়া শিরে করাঘাত করিতেছে।

ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অধঃপতন আর সম্ভবে না। ইহা অপেক্ষা মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্য আর নেত্রপথবর্ত্তী হয় না। আমরা যতদিন স্বদেশীয় দ্রব্যের আদর করিতে না শিখিব, ততদিন আমাদের মধ্যে জাতীয় ভাবের বিকাশ হইবে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে না পারিয়া, আমাদের শিল্পিগণ দিন দিন হীনাবস্থাপন্ন হই-তেছে বটে, কিন্তু প্রধানতঃ আমাদের দোষেই আমাদের দেশের শিল্প-দ্রব্যের অবনতি ঘটিতেছে। আমরা সামান্য খেলনাটি,—সামান্য দেশলাইটি পর্য্যন্ত বিলাত হইতে গ্রহণ করিতেছি। যতদূর সম্ভব, আমরা যদি ততদূর স্বদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই, তাহা হইলে দিন দিনই আমাদের শিল্পদ্রব্যের উন্নতি হইতে থাকে। আমা-দের দেশে উৎকৃষ্ট কাপড় প্রস্তুত হইতেছে,—কাঞ্চননগরে উৎকৃষ্ট ছুরি কাঁচি ও নাটাগড়ে উৎকৃষ্ট কলকব্জার কারখানা হইয়াছে, লিখিবার উৎকৃষ্ট কালী পাওয়া যাইতেছে; যৌথকারবারে কলকার-খানা, রেলওয়ে প্রভৃতির সূত্রপাত হইতেছে, এ সময়ে আমাদের নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে; ভিন্নদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া, জাতীয় ভাবে জলাঞ্জলি দেওয়াও কর্ত্তব্য নহে। আমরা এতদিন ইঙ্গরেজের

শাসনে বাস করিয়া, ইঙ্গরেজের সংস্পর্শে থাকিযা, যদি ইঙ্গরেজের আত্মনির্ভরের ভাব শিখিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের জীবন-ধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা যদি ক্রীতদাসের ন্যায়, নিরবচ্ছিন্ন অনুকরণেই ব্যাপৃত থাকি, জাতীয় ভাবে জলাঞ্জলি দিয়া, যদি নিউ-জিলণ্ডবাসী বা জুলুদিগের ন্যায় সর্ব্বাংশে সাহেবীভাবসংগ্রহ করি, এবং যদি নিয়ত পরমুখপ্রেক্ষী হইয়া দুর্ব্বহ দেহভার বহন করিতে থাকি, তাহা হইলে, আজই হিমালয়ের শৃঙ্গপাতে স্বদেশ বিচূর্ণ বা ভারত মহাসাগরের অতলজলে স্বদেশ নিমগ্ন হউক। পৃথিবীর মান-চিত্র হইতে স্বদেশের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যাউক, তাহাতে কিছু-মাত্র ক্ষতি নাই।

কিন্তু আমার আশা আছে যে, আমাদের দেশ পুনর্ব্বার জাতীয় ভাবে বলীয়ান্ হইবে। আমরা সকলেই কিছু হীন অনুকরণপ্রিয় ক্রীতদাসে পরিণত হই নাই। আমাদের ঘোরতর দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে; বহুবার, বহুজাতি আসিয়া আমাদিগকে নিপীড়িত, নির্জ্জিত ও নিগৃহীত করিয়াছে। তথাপি আমরা সর্ব্বাংশে পরের সহিত মিশিয়া যাই নাই। আমরা বহুকাল হইতে রাজনীতি বিষয়ে স্বাধীনতা হারা-ইয়াছি। ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের যে স্বাধীনতা ছিল, বর্ত্তমান সহবাস-সম্মতির আইনে তাহাও হৃত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন আচার ব্যবহারের সম্বন্ধে যে স্বাধীনতাটুকু আছে, আমরা তাহাও কি হারাইতে বসিব? না, তাহা কখনও হইবে না। জীবন থাকিতে আমরা এরূপ অধঃপতনের চরমসীমায় উপনীত হইব না।

মায়াবাদী উদাসীন পুরুষ, নিত্যসন্তোষ ও নিত্য তৃপ্তিতে বিভোর হইয়া বলিতে পারেন, নিয়তির বিচিত্র লীলায় ভারতের অদৃষ্টচক্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতির আবাসভূমি। ইহাদের ভাষা বিভিন্ন, পরিচ্ছদ বিভিন্ন, ধর্ম্মপ্রণালী বিভিন্ন। ইহা ব্যতীত,

দুরারোহ পর্ব্বত, দুর্গম অরণ্য, দুস্তর তরঙ্গিণী প্রভৃতিতে ভারতের জনপদ সকল পরস্পর পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত। ইহাতে ভারতবর্ষের জাতীয় ভাবে একীভূত হইবার সম্ভাবনা নাই। বিধাতা, ভারতের অদৃষ্টলিপিতে যাহার বিধান করিয়াছেন, ভারতবর্ষকে তদনুসারেই চলিতে হইবে। যাঁহারা কর্ম্মশীলতায় জলাঞ্জলি দিয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এ কথা তাঁহাদের মুখেই শোভা পায়। পৃথিবীর অপরাপর দেশে যখন এরূপ অন্তরায়েও জাতীয় ভাবে একীভূত হইয়াছে, তখন ভারতবর্ষ না হইবে কেন? ইতালির সহিত ভারতবর্ষের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। এশিয়ার মানচিত্রে যেমন ভারতবর্ষ, ইউরোপের মানচিত্র তেমনি ইতালি। উভয়ই, উভয় মহাদেশের দক্ষিণপ্রান্তবর্ত্তী একটি প্রশস্ত উপদ্বীপ। উভয়ের দক্ষিণ ভাগই সাগরের দিকে যাইয়া শেষ হইয়াছে। উভয়ের শীর্ষদেশেই অটল অচলবর, বিরাট পুরুষের ন্যায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া, প্রকৃতির অনুপম শোভা বিকাশ করিয়া দিতেছে। উভয়ের অন্তর্দ্দেশেই প্রসন্নসলিলা তরঙ্গিণী, তরঙ্গরঙ্গ বিস্তার করিয়া বহিয়া যাইতেছে। উভয়ই প্রকৃতিরাজ্যের রমণীয় স্থান। শ্যামল তরুলতায়, শস্যপূর্ণ, প্রশস্ত ক্ষেত্রে উভয়ই চিরশোভিত। অযত্নসম্ভূত সৌন্দর্য্যের গরিমায়, অনায়াসলভ্য ফলসম্পত্তির মহিমায়, উভয়ই বিভূষিত। পক্ষান্তরে, ভারতবর্ষের ন্যায় ইতালিও অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত উভয় দেশই বিভিন্ন বিদেশী আক্রমণকারীর পরাক্রমে নিপীড়িত, নির্জ্জিত ও স্বাধীনতায় বঞ্চিত। উভয় দেশই বিভিন্ন ভাষার জনগণে অধ্যুষিত। ভারতবাসীর ন্যায়, ইতালিবাসীও তাহাদের পূর্ব্বতন গৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। তাহারা সীজরের বীরত্বকীর্ত্তিতে গৌরবান্বিত হইত না, ব্রুতসের হিতৈষিতায় আত্মাভিমানপ্রকাশ করিত না এবং সিসিরোর বাগ্মিতায় পূর্ব্বমহত্ত্বের ছবি স্মৃতিপটে

অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইত না। এতদ্ব্যতীত, ইতালির এক জনপদের ভাষা, আর এক জনপদবাসী বুঝিতে পারিত না, তাহারা এক পূর্ব্বপুরুষ হইতে উৎপন্ন, এক ভ্রাতৃভাবে সম্বন্ধ ও একবিধ গৌরবে গৌরবান্বিত হইলেও, পরস্পরকে পৃথকভাবাপন্ন বিদেশী ভাবিত। তথাপি ইতালির এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে সমবেদনা সঞ্চারিত হয়, ইতালি অপূর্ব্ব জাতীয়ভাবে একীভূত হইয়া উঠে। এইরূপ স্বইজর্লণ্ড ও বেলজিয়মও বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালীর ও বিভিন্ন ভাষার লোকের আবাসস্থান হইলেও, প্রত্যেক দেশই একতায় সম্বন্ধ। ভারতবর্ষে নানা বিষয়ে বৈষম্য থাকিলেও, এই বৈষম্যের অভ্যন্তরে সাম্যের বীজ নিহিত রহিয়াছে। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, পঞ্জাবী, রাজপুত, মহারাষ্ট্রীয়, সকলেই এক হিন্দুবংশসম্ভূত। হিন্দুনাম উচ্চারণ করিলে, সকলের হৃদয়েই একটি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। রামচন্দ্রের চিত্তবিমোহিনী কথায় সকলেই বিমোহিত হয়েন, ভীষ্মের উদার চরিত্রে সকলের হৃদয়ই ভক্তিশ্রদ্ধায় আনত হয়, সীতা ও সাবিত্রীকে সকলেই পবিত্রতাময়ী মহাদেবী বলিয়া সম্মানিত করেন। প্রতাপসিংহ ও শিবজী, গুরু গোবিন্দসিংহ ও রণজিৎসিংহকে, সকলেই স্বজাতির ও স্বদেশের গৌরবকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শাক্যসিংহ ও শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য ও নানক, সকলের হৃদয়েই পবিত্র প্রেমস্রোত প্রবাহিত করেন। হিন্দুনাম, হিন্দুকীর্ত্তি, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি। এই সাধারণ সম্পত্তির মহিমায়, সকলেই সকলকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবে। এতদ্ব্যতীত, এক রাজার অধীন ও এক রাজকীয় বিধিতে পরিচালিত হওয়াতে, সকলেই একবিধ স্বার্থে দৃঢ়সম্বন্ধ হইয়া উঠিবে। বাঙ্গালী, জাতীয় আচারব্যবহার, জাতীয় রীতিনীতির মর্য্যাদারক্ষা করুন, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি জাতীয় ভাবে পরিচালিত হউন। শেষে সকলে, একবিধ স্বার্থে,—একবিধ স্বদেশ-

প্রীতিতে সম্বন্ধ হইয়া, স্বদেশের মুহ্যমান হৃদয়ে তাড়িতবেগ সঞ্চারিত করুন, এবং স্বদেশের শিল্পবিজ্ঞানের উৎকর্ষসাধন পূর্ব্বক পরমুখ-প্রেক্ষিতারূপ অপার কলঙ্কের মোচনে বদ্ধপরিকর হউন। হীন বংশ হইতে আমাদের উদ্ভব হয় নাই। আমাদের পিতৃপুরুষগণ যে সভ্যতা-লোক প্রসারিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই এখন জগৎ আলোকিত হইয়াছে। অধ্যাপক সীলি, তাঁহার একখানি গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ—"যখন মহাবীর শেকন্দর শাহ অপেক্ষাকৃত অমুন্নত প্রাচ্যদেশে আধি-পত্য স্থাপন করিয়া, গ্রীসের সভ্যতা ও জ্ঞানের পরিচয় দেন, তখন সেই সকল জনপদের অধিবাসীরা, ভক্তি ও প্রীতির সহিত গ্রীসের ঐ সভ্যতার সমাদর করিয়াছিল। রোম যখন গলের উপর সভ্যতালোক প্রসারিত করে, তখন গলের অধিবাসীরা উহার উজ্জ্বল ভাবে মোহিত হইয়া, বিজেতার প্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ করিয়াছিল। যে হেতু, রোমের ঐ আলোক তাহাদের হৃদয়কে আলোকিত করিয়া, জীবনের মহাব্রতসাধনে নিয়োজিত রাখিয়াছিল। কিন্তু, ভারতে ইঙ্গলণ্ডের আধিপত্যবিস্তারে, ভারতবর্ষীয় হিন্দুর হৃদয়ে, ঐরূপ কোনও ভাবের উৎপত্তি হয় নাই। অতি প্রাচীনকালে ভারতে জ্ঞানালোক প্রসা-রিত হইয়াছিল। ভারতে প্রাচীন সভ্যতা ছিল। অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার, অনুপম মহাকাব্য ছিল। জ্ঞানগরিমার ভিত্তি, দর্শনশাস্ত্রাদি ছিল। ঐ জ্ঞানালোকই এক সময়ে ধীরে ধীরে প্রতীচ্য ভূখণ্ডের একাংশ আলোকিত করিয়াছিল। আমরা ভারতে যে আলোক সমর্পণ করিয়াছি, তাহা প্রকৃত ও উজ্জ্বল হইলেও, হিন্দুর অধিকতর হৃদয়াকর্ষক ও অধিকতর কৃতজ্ঞতার উদ্দীপক হয় নাই। * * আমরা হিন্দুর অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ নহি। আমাদের হৃদয়, হিন্দুর হৃদয় অপেক্ষা অধিকতর প্রশস্ত বা অধিকতর উন্নত নহে। আমরা অজ্ঞাত ও অচিন্ত্য-পূর্ব্ব বিষয় সম্মুখে রাখিয়া, অসভ্যদিগকে যেরূপ বিস্ময়াবিষ্ট করিতে

পারি, হিন্দুকে সেরূপ পারি না। হিন্দু, তাঁহার কাব্যের গভীর ও উদার ভাব লইয়া, আমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন। এমন কি, তাঁহার নিকট অভিনব বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে, এরূপ বিষয় আমাদের বিজ্ঞানেও অল্প আছে।” এই প্রশস্তহৃদয়, সূক্ষ্মদর্শী লেখকের লেখনী হইতে এইরূপ বাক্য নির্গত হইয়াছে। আমরা এইরূপ মহামহিমাময় হিন্দুবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নহে। উৎসাহ ও উদ্যমে বলসম্পন্ন এবং প্রকৃতজ্ঞানে মহিমান্বিত হইয়া, সন্তানোচিত কার্য্য করা আমাদের কর্ত্তব্য। যে সিন্ধু ও সরস্বতীর মনোহর পুলিনে, যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া, প্রাচীন হিন্দুগণ পরমা শক্তির ধ্যান করিতেন, সে সিন্ধু সরস্বতী আজও বর্ত্তমান রহিযাছে। যে শান্তরসাস্পদ স্থানে, মনস্বী আর্য্যপুরুষগণ অমৃতময়ী সারস্বতী শক্তির উপাসনা করিতে করিতে সভ্যতার স্নিগ্ধজ্যোতির বিকাশ করিতেন, সে সকল স্থান আজও দর্শকের নেত্রপথবর্ত্তী হইতেছে। যে সকল নগর শিল্প বাণিজ্যে শ্রীসম্পন্ন হইয়া, সর্ব্বত্র সমৃদ্ধিগৌরবের পরিচয় দিত, তৎসমুদয় আজও মানচিত্রে শোভা পাইতেছে। আশা আছে, হিন্দু, অতীত গৌরবের সাক্ষীভূত এই সকল চিহ্ন দর্শনে আত্মবলে বলীয়ান হইবে, এবং অপূর্ব্ব জাতীয় ভাব ও ধর্ম্মোৎপাদ্য সভ্যতার গুণে, পুনর্ব্বার পৃথিবীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। যদি শত সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হয়, কর্ত্তব্য পথ যদি দুষ্প্রবেশ, দুর্গম ও দুর্গতিজনক হইয়া উঠে, তাহা হইলেও, এই পুণ্যপুঞ্জময় পবিত্র ভূমিতে, সভ্যতা ও জ্ঞানের আদিম আশ্রয়ক্ষেত্র এই লোকপূজিত ভূখণ্ডে, পুনর্ব্বার হিন্দুর জাতীয় ভাবের অমৃতময় ফলের বিকাশ দেখা যাইবে, এবং পুনর্ব্বার হিন্দুর অনন্ত ও অক্ষয় কীর্ত্তি, ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

সমাপ্ত।